Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-IV, July 2026, Page No. 66-72
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.04W.118

বিশ্বায়ন পরবর্তী একুশ শতকের নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে নৈতিকতা

নাতাশা পারভিন, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.07.2026; Accepted: 26.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Globalization is one of the most widely used and discussed concepts in the contemporary world. Scholars have explained it through terms such as 'Internationalization' and 'Liberalization', emphasizing the growing interconnectedness and mutual dependence among nations. Trade, technology, and business are no longer confined within national boundaries; instead, they now operate on a global scale. Closely linked with privatization, globalization is primarily driven by two major forces—capital and technology. Although economic in origin, globalization has gradually extended its influence into personal, familial, social, and cultural spheres of human life.

Literature, as a reflection of society, has always recorded the marks of historical crises such as wars and famines. Similarly, post-globalization Bengali short stories capture the changing patterns of everyday life shaped by global economic and cultural forces. In India, the economic reforms of 1991 and the adoption of a free-market economy significantly altered social structures and value systems. These transformations are clearly reflected in twenty-first-century Bengali short fiction.

In family life, the career-driven younger generation often prioritizes professional success over emotional attachment to roots and traditions. Individuals constantly attempt to enhance their market value by adapting themselves to modern demands. Parents increasingly prefer English-medium education for their children to maintain social status. As financial success gains greater importance than emotional bonds, family relationships lose depth and warmth. Moral values such as empathy, responsibility, and emotional commitment gradually weaken.

Technological advancement, which was expected to reduce emotional distance despite geographical separation, has often produced the opposite effect. Mobile phones, the internet, and social media have intensified isolation and weakened human relationships. While globalization promotes self-reliance, it simultaneously nurtures loneliness and moral indifference. These ethical crises and the erosion of human values occupy a central position in selected post-globalization Bengali short stories.

Keywords: Globalization, Technology, Business, Values, Morality

বর্তমান সময়ে বিশ্বায়ন এক অতিপরিচিত শব্দ। শব্দটির মধ্যে গতিময় এই বিশ্বের একীভূত হওয়ার অর্থ জড়িয়ে আছে। বিশ্বায়নের অন্যতম প্রবক্তা রোল্যান্ড রবার্টসনের মতে—

> "বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বের ক্রম সংকোচন (Compression of the World) এবং বিশ্বজোড়া পরস্পর নির্ভরশীলতা (Global inter-dependence) অবস্থা বোঝায়।"[১]

একদিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী পুঁজি— এই দুইয়ের মহামিলনে আজকের পৃথিবীতে বিশ্বায়ন জেগে উঠেছে। অর্থনীতির পরিভাষায় বিশ্বায়ন বলতে দেশীয় কাঁটাতারের সীমানার ঊর্ধ্বে অর্থ তথা পুঁজির আদানপ্রদান বোঝায়। অমর্ত্য সেন 'The Argumentative Indian' গ্রন্থে বিশ্বায়ন সম্পর্কে বলেছেন—

> It is through global movements of ideas, people, goods, and technology that different regions of the worlds have tended, in general, to benefit from progress and development occurring in other regions.[২]

ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বিশ্বায়নের মুক্ত অর্থনীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, "ঔপনিবেশিক অর্থনীতি কিন্তু দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন"[৩]। অর্থাৎ দেশ স্বশাসিত হলেও অর্থনীতি বিশ্বগ্রামের সঙ্গে জড়িত। এই বিশ্বায়ন আসলে উদারীকরণ তথা মুক্ত বাজার অর্থনীতির সমার্থক, পুঁজিবাদেরই সম্প্রসারিত রূপ। দেশীয় বিধিনিষেধের বেড়াজাল উঠে গিয়ে একদিকে যেমন মূলধনের আদানপ্রদান ঘটেছে, তেমনই নির্দিষ্ট অঞ্চলের তথা দেশের মানুষ অন্য অঞ্চলে বা বিদেশে জীবিকার উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো পরিষেবা ক্ষেত্রেও আজ বেসরকারিকরণের রমরমা চলছে। সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিশ্বায়ন-উত্তর বাংলা উপন্যাসের বহুমাত্রিকতা' প্রবন্ধে ১৯৭০ সাল পরবর্তী বেশ কিছু ঘটনাকে একত্রিতভাবে বিশ্বায়ন বলে চিহ্নিত করেছেন।

> "...তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি, দেশের সীমানা পেরিয়ে ক্রম বর্ধমান পুঁজি-প্রবাহ, টাকার বাজারে ফাটকাবাজি, আকাশপথে মাল পরিবহণের প্রচলন, ডিজনি সংস্কৃতির প্রসার, বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গণ-বিপণন, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কর্পোরেট সংস্কৃতি, নতুন আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজন, জাতি রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হ্রাস, উত্তর-আধুনিকতা, আসেম্বলি লাইন প্রোডাকশনের অবসানে ফোর্ড পরবর্তী উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি।"[৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত IMF বা International Monetory bank এবং International Bank for Reconstruction and Development যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে উন্নয়ন তথা নগরায়নের জন্য অর্থ ঋণ দিতে থাকে যার সঙ্গে থাকে এমন কিছু শর্ত যা উদারীকরণেরই নামান্তর। পাশাপাশি ১৯৯২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ার ফলে বিভিন্ন দেশ এই মুক্তবাজার অর্থনীতিতেই ভরসা করে। ১৯৯০-৯১ উপসাগরীয় যুদ্ধে পরে ভারতে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হলে নরসিমা রাওয়ের আমলে বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করা হয় এবং ভারত বিশ্বায়নের বলয়ে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে IMF থেকে আর্থিক সহায়তা নেওয়ার ফলে বিদেশি পুঁজিকে আহ্বান, বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ, টাকার মূল্যমান কমানো ইত্যাদি শর্ত ভারতকে মেনে নিতে হয়।

নৈতিকতা হল এমন একটি মানদণ্ড যা মানুষকে উত্তম হতে শেখায়; ভালো-খারাপ, উচিত-অনুচিতের বোধ তৈরি করে। এই নৈতিকতার আদর্শ সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। দীর্ঘকালীন নীতি কখনো কখনো সংস্কারের রূপ নেয়। যুগের বড়ো সংকটে এই নীতি-আদর্শের ধারণা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। কখনো পূর্বের চেয়ে উন্নত নীতি গৃহীত হয় আবার কখনো নীতির অবক্ষয়ও ঘটে। বিশ্বায়ন এমন একটি সংকট যেখানে এই নৈতিকতা তথা মূল্যবোধের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এই বিশ্বায়নের পরিবেশে মানুষ অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক। বিশ্বায়নের প্রভাবে বাঙালি জীবন ও মননে যে নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় সাম্প্রতিক বাংলা ছোটোগল্পে। এই আলোচনায় যে ছোটোগল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল—

লেখক	**ছোটোগল্প**	**প্রকাশকাল**
তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়	ব্রজর দুঃখ	আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০১৯
সুজিত বসাক	সোনার ডিম	আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০২১
বিনতা রায়চৌধুরী	অন্ধকার আকাশ	নবকল্লোল, ২০২৫
বিনতা রায়চৌধুরী	চেনা ছবির ভিতরে	বর্তমান পত্রিকা, ২০০৪
অম্লানকুসুম চক্রবর্তী	বাক্সের বাইরে	আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০২০
শাশ্বতী নন্দী	আবার সূর্য উঠবে	আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০২০

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা '**ব্রজর দুঃখ**' ছোটোগল্পটিতে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের অতিরিক্ত প্রযুক্তি-নির্ভরতা ও দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব। পান-বিড়ি-সিগারেট দোকানের মালিক কৃষ্ণবর্ণ ব্রজবাসী দাস গৌরবর্ণা বুল্টি সাহাকে বিয়ে করে। ব্রজর ইচ্ছা,

> "তার টুকটুকে ফর্সা সন্তান জন্মাবে! আর দশটা ভদ্দরঘরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশবে, ইংরেজি মিডিয়ামে পড়বে, গলায় টাই বেঁধে রিকশা করে এই ঢাউস ব্যাগ কাঁধে ইস্কুলে যাবে, মুখ দিয়ে ভুট্টার খই ফোটার মতো ইংরেজি বুলি ফুটবে, কথায় কথায় বাপ-মা'কে বলবে থ্যাঙ্ক ইউ, এক্সকিউজ মি।"[৪]

বিশ্বায়নের কারণে চিকিৎসা, স্বাস্থ্যের মতো পরিষেবামূলক ক্ষেত্রগুলো বেসরকারিকরণ হয়ে চলেছে। বিশ্বায়ন যেন সব শ্রেণির মনস্তত্ত্বে ঢুকিয়ে দিয়েছে বর্তমানের ইঁদুরদৌড়ে বাংলা মিডিয়ামের চেয়ে ইংরেজি মিডিয়াম অনেক বেশি 'স্মার্ট প্রোডাক্ট' তৈরি করতে সক্ষম। ব্রজর মতো অভিভাবকরা নিজেরা সাদামাটা হলেও সন্তানের জন্য অর্থকরী বিদ্যাকে ক্রয় করতে চেয়েছে। ফর্সা স্ত্রীকে ব্রজ পুরুষের নজর থেকে সতর্ক পাহারায় রেখেছে। কিন্তু পাশের বাড়ির সমবয়সি রুনু ও ঝুনুর স্মার্টফোন দেখে ও সেলফি তুলে বুল্টির মনে হয় মোবাইল ব্যবহার করতে না পারলে জীবন বৃথা।

> "দুটো ঢাউস মোবাইল ফোন আছে আর তাতে আছে চব্বিশ ঘন্টা নেটওয়ার্কিংয়ের সীমাহীন সুযোগ-সুবিধে! তাতে কত ছবি, কত মজা, কত খবর অডিয়ো-ভিডিয়ো, কত বন্ধু, কত কথা, আরও যে কত কী, তার কি শেষ আছে?"[৫]

মোবাইল পাওয়ার পর থেকে শুরু হয় ব্রজর প্রতি বুল্টির অনীহা, অবহেলা। স্বামী সংসার সব ভুলে সারাদিন সে মোবাইলে মগ্ন থাকে। শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে কাছে পেতে ব্রজও রনির সাহায্যে মোবাইল কিনে ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপে আত্মপরিচয় গোপন করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা শুরু করে। এমনকি শালীনতার মাত্রাও অতিক্রমও করে ফেলে কখনো কখনো। রনির কথায়, "আজকাল সব্বাই আমরা দু'জন করে মানুষ, একজন থাকে চোখের সামনে, আর-একজন স্মার্টফোনে।"[৬] এভাবেই সামাজিক জীবনের নানা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি ভুলতে মানুষ নিজের ডিজিট্যাল অস্তিত্বের মধ্যে আত্মসুখ খুঁজে নিতে চায়। কিন্তু ব্রজ ধীরে ধীরে তার জীবন থেকে হাসি তথা সুখ হারিয়ে ফেলে। আসলে বিশ্বায়ন মানুষকে অল্প সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা ভুলিয়ে দিয়েছে, মানুষকে 'আরো চাই'-এর মতো ভোগবাদী মানসিকতা গড়ে দিয়েছে। অতি আকাঙ্ক্ষার 'স্মার্টফোন' পেয়ে বুল্টি তাই অবলীলার স্বামীকে ভুলতে পেরেছে। ঘরের মানুষের চেয়েও মোবাইলের অপর প্রান্তে থাকা অচেনা ব্যক্তি তার কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। এমনকি অজানা পুরুষের উত্তেজক কথাবার্তায় বুল্টির প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকছে। স্থানিকভাবে কাছাকাছি থাকলেও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে স্বামী ব্রজকে স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করতে হচ্ছে। আসলে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে একদিকে মানুষের মধ্যে ভোগবাদী মানসিকতা যেমন গড়ে উঠেছে, পাশাপাশি সম্পর্কের বন্ধন অনেকখানি শিথিল হয়ে গিয়েছে।

সুজিত বসাকের লেখা '**সোনার ডিম**' ছোটোগল্পে উঠে এসেছে পণ্যায়িত মানুষের কথা। ঠাম্মা নিধুবালা দেবীর বিভিন্ন ভিডিয়ো খেলাচ্ছলে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাগ করে নেয় নাতনি মেঘা। বৃদ্ধা মানুষটির সারল্যে মুগ্ধ হয়ে প্রচুর মানুষ তার অনুরাগী হলে মেঘাও সেখান থেকে অর্থ উপার্জন করতে থাকে। বড়দাদার বিয়ে উপলক্ষে ঠাম্মাকে নিয়ে নানান রকমের ভিডিয়োর পরিকল্পনা করে রাখলেও বিয়ের দিন ঠাম্মার ভাইরাল ফিভার হলে ডাক্তারকে মেঘা বলে, "ডাক্তার কাকু, তুমি এমন ওষুধ দাও যাতে ঠাম্মা অন্তত বউভাত পর্যন্ত সুস্থ থাকে।"[৭] প্রথম দিকে ঠাম্মা ও নাতনির ভালোবাসার সম্পর্ক প্রকাশিত হলেও ধীরে ধীরে নাতনির তরফ থেকে ভালোবাসার মুখোশের অন্তরালে থাকা স্বার্থপর মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছে। অনুরাগীদের আবদারই মেঘার কাছে অনেক বড়ো, ঠাম্মার অসুস্থতা নয়। ঠাম্মার অসুস্থতা নিয়ে সে ভালোবাসার টানে চিন্তিত নয়, বরং তার চিন্তার কারণ ভ্লগের মূল 'কন্টেন্ট' নিধুবালা দেবীর অনুপস্থিত থাকা। এখানে অর্থ ও লক্ষাধিক ভিউজ-এর লোভে নাতনি মেঘা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। নেট অনুরাগীদের প্রত্যাশা মতো দাদার বিয়েতে ঠাম্মাকে নাচাতে গিয়ে ডাক্তারের দেওয়া কড়া ওষুধ মেঘা নিয়ম না মেনে একাধিকবার খাইয়ে দেয়। ফলত বিয়েতে দারুণ ভাবে নাচলেও গভীর রাতে নিধুবালা দেবী মারা যান। এই মৃত্যুতে মেঘার অনুভূতি—

> "একটা অব্যক্ত কষ্টকে চাপা দিয়ে কে যেন তার ভিতর থেকে চিৎকার করে বলে উঠছে, নিধুবালার ভ্লগের ভিউ, রিচ, শেয়ার–সব এক রাতেই বহু বহু গুণ বেড়ে যাবে।"[৮]

ঠাম্মার শরীরের কথা না ভেবে ওষুধ ওভারডোজ করে নাচের ভিডিও বানানোয় একদিকে মেঘার স্বার্থপর মানসিকতা উঠে এসেছে। কিন্তু অন্যদিকে মৃত্যুশোককে আচ্ছন্ন করে ভ্লগের ভিউ, রিচ, শেয়ারের কথা মেঘার মনের অবচেতনে উঠে এলে বোঝা যায় মেঘার মধ্যে মনুষ্যত্বের হনন ঘটেছে। লেখক যেন মূল্যবোধহীন সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। এই অমানবিকতা, যান্ত্রিকতা, ভিউ-রিচের পিছনে দৌড়ানো মানসিকতা এই প্রজন্মকে মনুষ্যত্বের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়।

বিনতা রায়চৌধুরীর লেখা **'অন্ধকার আকাশ'** ছোটোগল্পে দেখা যায় বিদ্যাচরণ ও ভারতীর একমাত্র পুত্র পিনাকী বসু কর্মসূত্রে সপরিবারে আমেরিকা প্রবাসী। ছোটো থেকে পালন করা পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক দুর্বল। পিতা মাতার প্রতি এই উদাসীনতায় বিদ্যাচরণ কষ্ট পান। বিদ্যাচরণের হঠাৎ মৃত্যুতেও পিনাকী সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারেনি, মুখাগ্নি করতে পারেনি। ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক পিনাকী ভারতীর কাছে কিছুদিন কাটিয়ে আবার বিদেশ পাড়ি দেয়। ফোনে পুত্রবধূর কাছে ভারতী জানতে পারেন বাড়ি বেচে পিনাকী মাকে পাকাপাকিভাবে নিজের কাছে এনে রাখতে চায়। ছেলের ভালোবাসায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে বাড়ি বিক্রি করে ভারতী বিদেশ যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে আসেন। কিন্তু তাঁর কুসন্তান মাকে বিমানবন্দরে ফেলে পালিয়ে যায়। এই সত্য ভারতীর মাতৃহৃদয়ের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়নি, তিনি অফিসারকে বলেছেন—

> "চলে গেছে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে? সে তো জানে,...আমি কিছু চিনি না, আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে।"[৯]

অর্থলিপ্সু সন্তানের কাছে বাবা-মাকে মূল্যায়িত হতে হচ্ছে অর্থের মানদণ্ডে। বিশ্বায়নের সময়ে আত্ম-উন্নতির পথে চলতে চলতে হারিয়ে যাচ্ছে সমস্ত নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ। যে পিতামাতা সন্তানকে হাত ধরে হাঁটতে চলতে শেখায়, তাদের প্রতি এই আচরণ নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচয় দেয়। বিশ্বায়নের পৃথিবীতে স্থান পায় না স্নেহ, ভালোবাসা, প্রীতি; স্থান পায় শুধু অর্থলালসা, যান্ত্রিকতা।

বিনতা রায়চৌধুরীর লেখা **'চেনা ছবির ভিতরে'** ছোটোগল্পে উঠে এসেছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের পারিবারিক সঙ্কট। বাবার কেনা জমিতে সূর্যশেখর নিখুঁত ভাবে নিজের বানানো বাড়িতে স্ত্রী কবিতা ও সন্তান বাবলুকে নিয়ে জীবনের দীর্ঘ পথ কাটিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। বাবলু তার স্ত্রী রাংতা ও সন্তান টিংকুকে

নিয়ে পুরী বেড়াতে যাওয়ার আগে বাবাকে প্রস্তাব দেয় বাড়িটি প্রমোটারকে বেচে দেবে ও পরিবর্তে ফ্ল্যাটে থাকবে। মধ্যবর্তী সময়ে বাবলুরা থাকবে রাংতার বাপের বাড়ি বরাহনগরে এবং বাবা মাকে রেখে আসবে বৃদ্ধাশ্রমে। ছোটোবেলায় বাবলুর খেলার জন্য রাখা ফাঁকা জায়গা দেখে রাংতার মনে হয় সেই জায়গাটুকু নষ্ট হয়েছে। নতুন ফ্ল্যাটের চিন্তায় তাই সে বলেছে, "ছোটবেলার প্রিয় জিনিস ওরকম ভেঙে চুরেই হারিয়ে যায়, তার জন্য শোক না করে নতুন প্রিয় জিনিস বানিয়ে নিতে হয়।"[১০] সূর্যশেখর সন্তানবাৎসল্যের ঊর্ধ্বে সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন। পুরী থেকে ফিরে বাবলু দেখে বাবার বন্ধু অতীন কাকু, অংশুকাকু ও অচলা মাসি একে একে তাদের বাড়িতে এসে থাকছেন। বাবা তাঁদের খাওয়া-খরচের টাকা বাবলুর হাতে দেন। বাড়ি বিক্রির কাগজে সই করাতে গিয়ে বাবলু জানতে পারে সূর্যশেখর বাড়িটাকে বৃদ্ধাশ্রম বানাবেন এবং এক মাসের মধ্যে তাদের অন্য বাড়ি খুঁজে নিতে হবে। সূর্যশেখর জানিয়েছেন,

> "নিজে কিছু গড়ে তোলো, চেনা ছবি তৈরি করো। দেখবে, তার মধ্যে বেঁচে থাকার একটা আলাদা সুখ আছে। তবে এ বাড়িও রইল। শেষ বিকেলে যদি ইচ্ছে হয়, এসে থেকো। তোমার টিংকু যদি তোমাদের জন্য কোনো 'সুখনীড়' খোঁজে, তাহলে এখানে চলে এসো।"[১১]

আসলে অতি সহজে পাওয়া সম্পদের প্রতি সন্তানের হার্দিক ভালোবাসা থাকে না। শৈশব কাটানোর পরেও বাবলুর কাছে আন্তরিক টানের পরিবর্তে বাড়িটির অর্থমূল্যই প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ নতুন প্রজন্মের কাছে সবকিছুই ক্রয়যোগ্য, লেন-দেন যোগ্য। স্ত্রী রাংতা ছোটোবেলায় সে বাড়িতে থাকেনি, তাই তার কাছে সেই বাড়ি গুরুত্ব পাচ্ছে না। কিন্তু বাবলু তার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত আবাসস্থলটি প্রমোটারের কাছে অর্থের লোভে বেচে দিতে চায়। যে পিতা মাতা তাকে ছোট থেকে অকৃত্রিম অপত্যস্নেহ দিয়ে বড়ো করে তুলেছেন, তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রাখার চিন্তাও তার মনে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। এমনকি রাংতা যখন বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রম থেকে ফিরিয়ে না এনে ছেলেকে আলাদা ঘর দেওয়ার কথা বলেছে, সে তাতেও সম্মতি দিয়েছে। সূর্যশেখরের এই পরিকল্পনার পিছনে আছে বাবলু ও তার ছেলে টিংকুকে শেখানোর উদ্দেশ্য। কারণ স্নেহের পাশাপাশি উত্তরসূরীকে সঠিক শিক্ষা দেওয়াও পূর্বসূরীর কর্তব্য। এই অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার করা প্রবীণ সূর্যশেখর নিজের দ্বায়িত্ব বলে মনে করেছেন।

অম্লানকুসুম চক্রবর্তীর 'বাক্সের বাইরে' ছোটোগল্পে দেখানো হয়েছে বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে অনুভূতির ব্যবসায়ীকরণ। গল্পকথক সুকল্যাণ বসু চাকরিসূত্রে বস্টনে থাকাকালীন বাবা মারা গেলে মায়ের আকুতি সত্ত্বেও দেশে থাকেনি সে। মায়ের মৃত্যুর পর তার চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে ব্যবসা করার মানসিকতা তৈরি হয়। সে 'আন্তোপ্রানো' বা উদ্যোক্তা হতে চায়। সে 'অসহায়তা'র ওপর ব্যবসা করতে শুরু করে। যাঁদের পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, নাতি, নাতনি দেশের বাইরে থাকে, তাদের স্মৃতি নিয়ে এদেশে যে বাবামায়েরা একাকী দিন কাটান, তাঁদের সহায়তা করেই সে মোটা টাকা উপার্জন করতে চায়। সেই লক্ষ্যেই নিজস্ব অ্যাপ, ওয়েবসাইট তৈরি করে স্বল্প পারিশ্রমিকের কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করে। সহমর্মীর মতো কাস্টমারদের ছেলে মেয়ের খবর নিলেও তার আসল উদ্দেশ্য নিজের কাজের 'ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট' করা। নিজের আচরণে সাধুতা বজায় রেখে ব্যবসার স্বার্থে সুকল্যাণ বসু ব্যবহার করেছে বাবা মায়ের মৃত্যুর ঘটনাকেও। ব্যবসার স্ট্র্যাটেজি হিসেবে সে ব্যক্তিগত দুঃখ বেচেছে 'ক্লায়েন্ট'-এর কাছে। সে বলেছে,

> "বাবা চলে যাওয়ার পর ফোনে মায়ের হাহাকারমাখা নিঃশ্বাসের কথা মনে পড়ত। এ ধরণের লোপ্পা বলে টুক করে এন্ট্রি নিয়ে নিতে হয়। স্যর, ম্যাডাম থেকে ডিরেক্ট মাসিমা কিংবা মেসোমশাইয়ে আপগ্রেড। বলতাম, 'মাসিমা, আমি আপনার ছেলের মতো। যে-কোনও

> দরকারে আমায় ডাকবেন। শরীরটাও তো ভালো মনে হচ্ছে না। একটা ফুল বডি চেক-আপের আরেঞ্জমেন্ট করিয়ে দিই?"[১২]

গ্রসারি, ডাক্তার, ওষুধের পাশাপাশি সে নিজস্ব অ্যাপের সাহায্যে ঘণ্টায় ৫০০ টাকার বিনিময়ে 'কম্প্যানিয়নশীপ' পরিষেবা দেওয়া শুরু করে। অর্থাৎ একাকী থাকা মানুষগুলোর সঙ্গে সে অর্থের বিনিময়ে কিছু সময় কাটাতে যায়, সন্তান-সন্ততী নিয়ে তাঁদের সুখ দুঃখের কথা শুনতে যায়। আসলে সন্তানেরা নিজেদের ক্যারিয়ার ও জীবন গুছিয়ে নিতে ঝাঁ চকচকে শহরে অথবা বিদেশে চলে যায়, আর একাকী পড়ে থাকা বাবা মা সন্তানের স্মৃতি আঁকড়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকে। বিশ্বায়নের যুগে সবই পণ্য— মানুষ পণ্য, আবেগ পণ্য, অনুভূতি ভালোবাসা পণ্য। ব্যবসায়ী সুকল্যাণ বসু মহৎ বা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করেনি, বরং সততার মুখোশ পরে সে বয়স্ক মানুষের অনুভূতি নিয়ে ব্যবসা করেছে। একদিকে সুকল্যাণ বসুর অনুভূতির ব্যবসায়ীকরণ নৈতিক অবক্ষয়ের কথা তুলে ধরে, উল্টোদিকে সেই একাকী বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কথা ভাবলে এই উদ্যোগকে সম্পূর্ণ খারাপ দৃষ্টিতে দেখা যায় কি? অর্থের বিনিময়ে হলেও তো তাঁরা প্রশান্তি পাচ্ছেন, নিজেদের গুরুত্ব দেখতে পাচ্ছেন। তাঁদের নিয়েও কেউ যে চিন্তিত— এই ভাবনাও তাঁদের ক্ষণিক মানসিক প্রশান্তির উৎস।

শাশ্বতী নন্দীর লেখা **'আবার সূর্য উঠবে'** ছোটোগল্পটি লকডাউনে সুন্দরবনের দেশের বাড়িতে আটকে পড়া পরিবারের। দাদু শুভময় চ্যাটার্জি ছেলে বউমা নাতি নাতবউকে পূর্ববর্তী বিভিন্ন সংকটের গল্প বলেন। বস্ত্রসংকটে নিজের মায়ের কষ্টের কথা বলেন। তাঁর ছেলে পোশাক ব্যবসায়ী সলিল দুই বছরের চেষ্টায় মুম্বাই থেকে বিদেশে নিজের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছে। লকডাউনে নিজের আর্থিক ক্ষতি নিয়ে চিন্তিত সলিল বাবার মুখে বস্ত্রসংকটের কথা শুনে পয়লা বৈশাখের উপহার স্বরূপ কিছু পোশাক দরিদ্রদের মধ্যে দান করার মনস্থির করে ফেলে। অর্থের পিছনে ধাবমান সলিল অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সংকটের মুহূর্তে মানবিক হয়ে উঠেছে। মানব সভ্যতা যত কঠিন সংকটের মুখে পড়ুক তবুও মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস হারানো যায় না। যতই সংকট আসুক, সংকটের বর্ম ভেদ করে মানুষের হাত ধরে মানবিকতা মাথা তুলে দাঁড়াবে। এই বিশ্বায়নের পৃথিবীতে যেখানে সবাই আত্ম-উন্নতির ছুটে চলেছে সেখানে সলিল যেন প্রকৃতির মাঝে থেকে নৈতিকতার পথে চলেছে। এখানে সংকটের সময়ে সহমর্মিতা, সমবেদনা তৈরি হওয়ার মতো ইতিবাচক দৃশ্য লেখিকা তুলে ধরেছেন।

সাহিত্য সময়ের স্বর, সমাজের স্বর। নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প বিশ্বায়নের দ্বারা প্রভাবিত সাম্প্রতিক বাঙালি মননের মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিকতার পরিবর্তন উঠে এসেছে। যৌথ পরিবারের ধারণা পেরিয়ে বর্তমানের একক পরিবার সংগঠিত হলেও এখনও পিতামাতার দেখাশোনা সন্তানের কাছে ভার হয়ে উঠেছে। শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বাড়ি, বাবা মা এখন অর্থমূল্যের বিচারে নগণ্য। তাই জীবন থেকে কখনো তাদের সরিয়ে ফেলা, কখনো বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সারল্যকে ব্যবহার করে নিজের জীবন গুছিয়ে নেওয়ার মতো স্বার্থপর মানসিকতা তৈরি হয়েছে। আবার স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া জীবনের সঙ্গে এতোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে যে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সম্পর্কের সমীকরণগুলো বদলে গিয়েছে। আবার করোনা অতিমারীর পরিস্থিতিতে মানবিকতার দৃশ্য অঙ্কনের ইতিবাচক বার্তায় বোঝা যায়, নেতিবাচকতাই শেষ কথা নয়। সভ্যতার সংকটে সমস্ত প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে আবার মানবতারই জয় হবে।

তথ্যসূত্র:

১. দালাল, প্রণবকুমার। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্ব'। কলকাতা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ-২০১৯, পৃ. ৩১০।

২. Sen, Amartya. "The Argumentative Indian." Global Relation and History, New York, Farrar, Straus and Giroux, First American Edition-2005, pp. 345.

৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র। বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ-ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৫।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচরিতা (সম্পা)। বিশ্বায়ন পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি। কলকাতা, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ-মে, ২০২৫। পৃ. ১১।

৫. বসু, সুবর্ণ। 'রবিবাসরীয় পঞ্চাশটি গল্প'। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ-ডিসেম্বর, ২০২৩, পৃ. ৮২।

৬. তদেব, পৃ. ৮৩।

৭. তদেব, পৃ. ১৭৭।

৮. তদেব, পৃ. ১৭৮।

৯. রায়চৌধুরী, বিনতা। 'শ্রেষ্ঠ গল্প'। কলকাতা, দে'জ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি, ২০২০। পৃ. ২২৩।

১০. তদেব, পৃ. ৯৩।

১১. তদেব, পৃ. ৯৮।

১২. বসু, সুবর্ণ। 'রবিবাসরীয় পঞ্চাশটি গল্প'। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ-ডিসেম্বর, ২০২৩, পৃ. ১৫৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বসু, সুবর্ণ। রবিবাসরীয় পঞ্চাশটি গল্প। কলকাতা; আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২৩।

২. রায়চৌধুরী, বিনতা। শ্রেষ্ঠ গল্প। কলকাতা; দে'জ পাবলিশার্স, ২০২০।

৩. দালাল, প্রণবকুমার। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্ব। কলকাতা; বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯।

৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র। বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি। কলকাতা; পুস্তক বিপণি, ২০০২।

৫. বাগচী, অমিয় কুমার (সম্পাঃ)। বিশ্বায়ন ভাবনা-দুর্ভাবনা। কলকাতা; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৮।

৬. Sen, Amartya. The Argumentative Indian. New York, Farrar, Straus and Giroux, First American Edition-2005.